প্রচলিত শ্রম আইন ও শ্রম (সংশোধন) আইন: মালিকশ্রেণির রক্ষাকবচ

শামীম ইমাম

২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার তড়িঘড়ি করে 'বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬' নামের আইনটি পাস করে। আগের সরকারগুলোর মতো মহাজোট সরকারও প্রয়োজনীয় গণতান্ত্রিক রীতিনীতি না মেনে ১৫ জুলাই ২০১৩ তে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর সংশোধনী প্রস্তাব জাতীয় সংসদে পাস করে এবং ২২ জুলাই বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩ নামে গেজেট আকারে প্রকাশ করে। বর্তমান প্রবন্ধে এই দুই আইনে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী অবস্থানের অভিন্নতা ও ধারাবাহিকতা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২০০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অষ্টম জাতীয় সংসদের শেষ অধিবেশনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকার শ্রম আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি না মেনে বিরোধী দলের সাংসদদের আলোচনার জন্য ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সময় না দিয়ে খুবই স্বল্প সময়ের লোকদেখানো আলোচনার ভিত্তিতে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ নামের আইনটি (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) পাস করে। সংসদে বাংলাদেশ শ্রমবিল, ২০০৬ উত্থাপনের পূর্বে দেশের শ্রমিক আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত শ্রমিক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, শ্রমিক নেতৃবৃন্দের মতামত জানার জন্য, মতামত সংগঠিত করার জন্য নেয়া হয়নি প্রয়োজনীয় কোন কার্যকর উদ্যোগ। মূলত শ্রমিক স্বার্থের পক্ষের গুরুত্বপূর্ণ কোনো সুপারিশও গ্রহণ করা হয়নি। সংগত কারণেই তখন চারদলীয় জোট সরকারের বাইরের জাতীয় শ্রমিক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ও ট্রেড ইউনিয়নগুলো এই আইনটিকে 'অগণতান্ত্রিক শ্রম আইন' হিসেবে আখ্যায়িত করে প্রত্যাখ্যান করে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ প্রকৃত অর্থে দেশের পূর্বেকার (এই শ্রম আইন অনুমোদনের আগ পর্যন্ত) শ্রম আইনগুলোর সংশোধিত, পরিবর্তিত ও সমন্বিত রূপ। এই সমন্বয়ের কাজটি ১৯৯২ সালে 'শ্রম আইন কমিশন' এর মাধ্যমে শুরু হয়। পূর্বেকার শ্রম আইনের ২৭টি আইন রহিত করে তাদের সমন্বয়ে নতুন আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইনগুলোতে মূলত কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের চাকরির শর্তাবলি, ট্রেড ইউনিয়ন গঠন ও শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তি, ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ ও মজুরি পরিশোধ, শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা, দুর্ঘটনা প্রতিরোধ ও ক্ষতিপূরণ প্রদান, শ্রম কল্যাণ, শিশুশ্রম, শিল্প পরিসংখ্যান সংগ্রহ, অভিবাসন, পরিবহন সেক্টর, সংবাদপত্র, চা বাগান, ডক, খনি, হোটেল-রেস্তোরাঁ, রফতানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের চাকুরির শর্তাবলি ইত্যাদি সম্পর্কিত বিধান রয়েছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ প্রণয়নের আগে থেকেই জাতীয় গণতান্ত্রিক শ্রমিক ফেডারেশন, বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন, গার্মেন্টস শ্রমিক সংগ্রাম পরিষদসহ শ্রমিক সংগঠনগুলো গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলন করে আসছিল, যা বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ প্রণয়নের পরেও চলতে থাকে এবং এখনো জারি আছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধনকল্পে অতীতের সরকারগুলোর ধারাবাহিকতায় কার্যত কোনো রীতিনীতি, নিয়ম-পদ্ধতি না মেনে গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পক্ষে রাষ্ট্রপতি ডিসেম্বর ২০০৭-এ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধনী অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করেন। ওই সংশোধনীটি ছিল একদেশদর্শী ও চরম অগণতান্ত্রিক। এই সংশোধনীটি ছিল স্থিতিশীল শ্রম পরিস্থিতি ও শিল্পের বিকাশকে অব্যাহত রাখা এবং সুশাসন ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী। তখন যৌক্তিক কারণেই দেশের রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, শ্রমিক নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে উক্ত সংশোধনী অধ্যাদেশ বাতিলের দাবি জানানো হয়। এই দাবিতে জোরালো শ্রমিক আন্দোলনের একপর্যায়ে তৎকালীন সরকার সংশোধনী অধ্যাদেশের পুরোটার পরিবর্তে একাংশ গেজেট আকারে প্রকাশ করতে বাধ্য হয়।

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার প্রথমবার ক্ষমতায় এসে প্রচলিত শ্রম আইনের অগণতান্ত্রিক ধারাসমূহ বাতিল করে গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়নের লক্ষ্যে 'শ্রম আইন সংশোধন কমিটি' গঠন করে। এই কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত শ্রমিক সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে বেশ কয়েকটি সংশোধন প্রস্তাবও দেয়া হয়। আলাপ-আলোচনা ও সংশোধন প্রস্তাব নিয়ে বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম আইন সংশোধন কমিটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, কিছু সংশোধনী গ্রহণ করা হবে। অথচ সত্য হলো, শ্রমিক সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে দেয়া সংশোধনীগুলো গ্রহণ করা হয়নি, গ্রহণ করা হয়েছে মালিকদের পক্ষ থেকে দেয়া প্রস্তাব। অতীতের সরকারগুলোর মতো মহাজোট সরকারও প্রয়োজনীয় গণতান্ত্রিক রীতিনীতি না মেনে স্বৈরতান্ত্রিকভাবে গত ১৫ জুলাই ২০১৩ বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-এর সংশোধনী প্রস্তাব জাতীয় সংসদে পাস করে এবং ২২ জুলাই বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩ নামে গেজেট আকারে প্রকাশ করে। গেজেট আকারে প্রকাশের পর থেকে তা আইন হিসেবে গণ্য হচ্ছে। অথচ আওয়ামী লীগ গত নির্বাচনে তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ওয়াদা করেছিল, আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী একটি গণতান্ত্রিক শ্রম আইন প্রণয়ন করবে। শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩ আবার একই সত্য তুলে ধরল, সেটি হচ্ছে– মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ, বিএনপি তথা মহাজোট ও জোট সরকারের মধ্যে আসলে কোনো পার্থক্য নেই।

মহাজোট সরকারের 'বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩' গেজেট আকারে প্রকাশের পর দেশের রাজনৈতিক দল, শ্রমিক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে এই আইনের শ্রমিক ও শিল্পস্বার্থ বিরোধী অগণতান্ত্রিক ধারাসমূহ বাতিলের দাবি জানানো হয়েছে। বিশ্বব্যাপীও সমালোচিত হয়েছে মহাজোট সরকারের পাস করা এই শ্রম (সংশোধন) আইন। বিশ্বের ১৫৩ দেশের ৩০৮টি সংগঠনের এফিলিয়েটেড সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশন (আইটিইউসি) সংশোধিত শ্রম

আইনের সমালোচনা করে বলেছে, সংশোধিত শ্রম আইন আন্তর্জাতিক মানের অনেক নিচে অবস্থান করছে। ট্রেড ইউনিয়নবিরোধী মনোভাবের কারণে আইনের মধ্যে থেকেই সংগঠিত হওয়ার সুযোগ থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করা সহজ হবে। এছাড়া অন্য আরও শ্রমিক ও মানবাধিকার শ্রমিক সংগঠনগুলোও এই বিষয়ে তাদের অসন্তুষ্টির কথা জানিয়েছে।

বর্তমান মহাজোট সরকার আবারও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি, নিয়ম-পদ্ধতি অনুযায়ী দেশের শ্রমিক আন্দোলনের সাথে সম্পর্কিত শ্রমিক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন, শ্রমিক নেতৃবৃন্দের মতামত জানার জন্য, মতামত সংগঠিত করার জন্য প্রয়োজনীয় কার্যকর উদ্যোগ না নিয়ে খুবই স্বল্প সময়ের লোকদেখানো আলোচনার ভিত্তিতে শ্রম বিধিমালা প্রণয়নে তৎপর রয়েছে।

কী আছে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এ?

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর শ্রমিক ও শিল্পস্বার্থ বিরোধী কয়েকটি অগণতান্ত্রিক ধারা হচ্ছে:

এক. নতুন শ্রম আইনের ধারা ১০০ তে বলা হয়েছে, *"কোন প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিক কোন প্রতিষ্ঠানে সাধারণত দৈনিক ৮ ঘণ্টার অধিক সময় কাজ করিবেন না বা তাঁহাকে দিয়া কাজ করানো যাইবে না; তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ১০৮-এর বিধান (অধিককাল কর্মের জন্য অতিরিক্ত ভাতা) সাপেক্ষে, উক্তরূপ কোন শ্রমিক দৈনিক ১০ ঘণ্টা পর্যন্তও কাজ করিতে পারিবেন।"* অর্থাৎ আইনের এই ধারার মাধ্যমে মালিকপক্ষ কর্তৃক শ্রমিকদেরকে অতিরিক্ত খাটানোর সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য শ্রমিকের সম্মতির প্রয়োজন হলেও এখানে তা স্পষ্ট করা হয়নি। তাছাড়া ইতিপূর্বে খাওয়া ও প্রার্থনা বিরতিসহ কর্মঘণ্টা হিসাব করা হলেও নতুন আইনে খাওয়া ও বিশ্রামের জন্য বিরতি ব্যতীত সময়কে কর্মঘণ্টা বলা হয়েছে। আমরা জানি, অতীতে আইন লঙ্ঘন করে মালিকপক্ষ ৮ ঘণ্টা কর্মঘণ্টার জায়গায় শ্রমিকদের ১২-১৬ ঘণ্টা কাজ করিয়েছে; এখনো করাচ্ছে (যেমন– গার্মেন্টস সেক্টরে)। এ রকম একটি পরিস্থিতিতে এই ধারাটি প্রণয়নের ফলে মালিকপক্ষকে দ্বিগুণ মজুরির টোপ দিয়ে, এর অপব্যবহার করে দৈনিক কর্মঘণ্টাকে ৮ ঘণ্টা থেকে ১০ ঘণ্টায় নিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। অথচ দৈনিক কর্মঘণ্টা ৮ ঘণ্টার দাবি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি দাবি, একটি স্বীকৃত মানবাধিকার, যার ব্যতিক্রমের কোনো সুযোগ নেই। এ ছাড়াও আইনানুযায়ী, ইতিমধ্যে অর্জিত ও ভোগ করা কোনো অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করার কোনো নিয়ম নেই।

দুই. এই শ্রম আইনের ধারা ১৮০ তে বলা হয়েছে, *"কোন ট্রেড ইউনিয়নের গঠনতন্ত্রে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি উহার কর্মকর্তা অথবা সদস্য নির্বাচিত হওয়ার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি– (ক) তিনি নৈতিক স্খলনজনিত কোন ফৌজদারি অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া থাকেন। অথবা ধারা ১৬২(২)(ঘ) অথবা ধারা ২৯৮ এর (ভবিষ্য তহবিল এবং ট্রেড ইউনিয়ন তহবিলের অর্থ আত্মসাৎ এর দণ্ড) অধীন কোন অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত হইয়া থাকেন এবং তাহার মুক্তিলাভের পর দুই বৎসর কাল অতিবাহিত না হইয়া থাকে; (খ) যে প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা হইয়াছে, সে প্রতিষ্ঠানে তিনি শ্রমিক হিসাবে নিয়োজিত বা কর্মরত না থাকেন।"* দ্বিতীয় শর্তটি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

পুরনো আইনে একসময় কর্মরত ছিলেন এমন অবসরপ্রাপ্ত, চাকরিচ্যুতদের প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ইউনিয়নের সদস্য হওয়ার অধিকার ছিল। কিন্তু এখন চাকরি নিয়ে মামলা লড়া শ্রমিকদের ইউনিয়ন করার সুযোগ থাকল না। এছাড়া অতীতে রাজনৈতিক কর্মীরা শ্রমিকদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তুলতেন। নতুন আইনে সেই অধিকার খর্ব করা হয়েছে। এই আইন কার্যকর হলে বর্তমানে দেশের নেতৃস্থানীয় অনেক শ্রমিকনেতা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে আর ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারবেন না। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন অভিজ্ঞ পোড় খাওয়া শ্রমিক নেতৃত্বশূন্য করা এবং আন্দোলনের মাঠপর্যায়ে শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে শিক্ষিত রাজনীতি সচেতন সংগঠকদের আগমন বন্ধ করার জন্যই সরকার মালিকশ্রেণির পক্ষে এই ধারা প্রণয়ন করেছে। এছাড়া শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি, কোনো শিল্পপ্রতিষ্ঠানে/শিল্পাঞ্চলে বড় কোনো আন্দোলন সংগঠিত হলে মালিকপক্ষ আন্দোলনকারী শ্রমিক, শ্রমিক নেতৃবৃন্দের নামে একাধিক মিথ্যা মামলা দায়ের করে। অতীতের এবং সাম্প্রতিক সময়ে কর্মস্থলে নিরাপত্তা ও মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে আশঙ্কা করে একথা অনায়াসে বলা যায় যে, মালিকরা ইউনিয়নকর্মীদের চাকরিচ্যুত করে/মিথ্যা মামলা দিয়ে এই ধারার ব্যাপক অপব্যবহার করবেন।

তিন. এই শ্রম আইনের ধারা ১৯০ এ বলা হয়েছে, *"(১) এই ধারার অন্য বিধান সাপেক্ষে, শ্রম পরিচালক কোন ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রি বাতিল করিতে পারিবেন, যদি ...(ঙ) উহা কোন অসৎ আচরণ করিয়া থাকে;"* আবার, ধারা ১৯৬ এ শ্রমিকের পক্ষে অসৎ শ্রম আচরণ শিরোনামে বলা হয়েছে, *"মালিকের বিনা অনুমতিতে কোন শ্রমিক তাহার কর্মসময়ে কোন ট্রেড ইউনিয়নের কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত থাকিবেন না; তবে শর্ত থাকে যে, কোন প্রতিষ্ঠানের যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধির সভাপতি বা সাধারণ সম্পাদক-এর ট্রেড ইউনিয়ন কাজকর্মে নিয়োজিত থাকার ব্যাপারে এই উপ-ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না। যদি উক্তরূপ কর্মকাণ্ডে এই আইনের অধীন কোন কমিটি, আলাপ-আলোচনা, সালিস মধ্যস্থতা অথবা অন্য কোন কর্মধারা সম্পর্কে হয় এবং মালিককে তৎসম্পর্ক যথাসময়ে অবহিত করা হয়।"* এই ধারা দুটির মাধ্যমে কোনো মালিক যদি তাঁর প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কোনো ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে চান তাহলে তিনি সহজেই তা করতে পারবেন। শুধু তা-ই নয়, ধারা দুটির মাধ্যমে শ্রমিকদেরকে তাঁর ইচ্ছামতো ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ড থেকে বিরত বা দূরে রাখতে পারবেন, যা মূলত আইনি লেবাসে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার খর্ব বা খণ্ডিত করার শামিল।

> মাঠপর্যায়ে শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে শিক্ষিত রাজনীতি-সচেতন সংগঠকদের আগমন বন্ধ করার জন্যই সরকার মালিকশ্রেণির পক্ষে এই ধারা প্রণয়ন করেছে।

চার. এই আইনের ধারা ২১১(৮) এ বলা হয়েছে, *"যদি কোন প্রতিষ্ঠান নতুন স্থাপিত হয়, অথবা বিদেশি মালিকানাধীন হয়, অথবা বিদেশি সহযোগিতায় স্থাপিত হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন শুরু হওয়ার পরবর্তী তিন বৎসর পর্যন্ত ধর্মঘট কিংবা লক-আউট নিষিদ্ধ থাকিবে। তবে উক্তরূপ প্রতিষ্ঠানে উত্থিত কোন শিল্প বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ে বর্ণিত অন্যান্য বিধান প্রযোজ্য হইবে।"*

এই ধারার ফলে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার আইনি অধিকার সংকুচিত হলো, খণ্ডিত হলো। মালিকশ্রেণিকে তিন বছরের জন্য

আইনি বাধ্যবাধকতার উর্ধ্বে থাকার সুযোগ করে দেয়া হলো। ফলে মালিকপক্ষ তিন বছরের জন্য ইচ্ছামতো কারখানা পরিচালনা করতে পারবেন। আর শ্রমিকরা সংগঠন-সংগ্রাম করার স্বাধীনতাসহ সাংবিধানিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হলো। বঞ্চিত হলো আইএলও সনদে স্বীকৃত মৌলিক মানবাধিকার থেকে। আইনের উর্ধ্বে থাকার এই 'আইনি ছাড়পত্র' অধিক সময়কাল কাজে লাগাতে মালিকশ্রেণি কর্তৃক তিন বছর পর পর কারখানার নাম পাল্টানোর বা অন্য কোনো ফাঁকফোকর বের করার আশঙ্কা এক্ষেত্রে থেকেই যায়। অর্থাৎ নতুন এই আইনে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার সংকুচিত/খণ্ডিত করা হয়েছে; রাজনৈতিক কর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলার অধিকার হরণ করা হয়েছে।

পাঁচ. পূর্বেকার আইনে ছিল, কোনো কারণ না দেখিয়ে মালিক শ্রমিকের চাকরির অবসান করতে পারবেন না। তবে মাসিক বেতনভুক্ত/নিযুক্ত শ্রমিকদেরকে ১২০ দিনের লিখিত নোটিশ অথবা ১২০ দিনের মজুরি দিয়ে বিদায় করতে পারবেন। অন্যান্য শ্রমিককে ৬০ দিনের লিখিত নোটিশ অথবা সমপরিমাণ মজুরি দিয়ে বিদায় দিতে পারবেন। এবং তৎসহ প্রতি এক বছরের বা ছয় মাসের অধিককালের চাকরির জন্য ত্রিশ দিনের করে মজুরি ক্ষতিপূরণ হিসেবে পরিশোধ করবেন। [১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইন, ধারা ১৯ এবং ১৯৬৮ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) বিধিমালা, ধারা ১৬ দ্রষ্টব্য]

এ ছাড়াও ওই আইন ও বিধিমালা অনুযায়ী একজন শ্রমিক তাঁর চাকরির অবসান করতে চাইলে, মাসিক মজুরিতে নিযুক্ত শ্রমিকের ক্ষেত্রে এক মাসের নোটিশ, অন্য শ্রমিকের ক্ষেত্রে চৌদ্দ দিনের নোটিশ, লিখিতভাবে মালিককে প্রদান করতে হতো। যিনি তাঁর চাকরি অবসান করেন তিনি ধারা ১৯ এর (১) উপধারায় বর্ণিত কোনো ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী হবেন না। কিন্তু তিনি এই আইনের অধীনে বা প্রচলিত অন্য কোনো আইনে অন্য কোনো সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা থাকলে তা অবশ্যই পাবেন।

অথচ নুতন আইনের ধারা ২৬ (এই ধারার বিরুদ্ধে পাকিস্তান আমলেও শ্রমিকরা আন্দোলন করেছিল। তখন এটা ছিল ১৯(ক) ধারা।) এ অন্যান্য শ্রমিকের ক্ষেত্রে ৬০ দিনের লিখিত নোটিশ অথবা সমপরিমাণ মজুরি দিয়ে চাকরির অবসান করার আইনটি বাদ দেয়া হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, এই আইনের ধারা ২৭(১) এ স্বেচ্ছায় শ্রমিক কর্তৃক চাকরি অবসানের/ছাড়ার জন্য ৬০ দিন আগে নোটিশ দেয়ার কথা বলা হয়েছে (পূর্বেকার আইনে যা ছিল ৩০ দিন)। অথচ সরকারি চাকরি ছাড়ার ক্ষেত্রেও ৬০ দিন আগে নোটিশ দেয়ার কোনো বিধান নেই। উপরন্তু এই আইনানুযায়ী [ধারা ২৭(৩)] নোটিশ না দিলে নোটিশ মেয়াদের জন্য সমপরিমাণ অর্থ মালিককে দেয়ার কথা বলা হয়েছে, যা পূর্বেকার আইনে ছিল না। এই আইনে স্বেচ্ছায় চাকরি ছাড়া স্থায়ী শ্রমিক বাদে অন্যান্য শ্রমিককে অত্র আইনে বা প্রচলিত অন্য কোনো আইনের অন্য কোনো সুযোগ-সুবিধা ভোগ করা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। স্থায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও দৃশ্যত নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা বলা হলেও [ধারা ২৭(৪)] কার্যত অধিকাংশই তা পাবেন না। অর্থাৎ নতুন আইনে শ্রমিকদেরকে টারমিনেশন বেনিফিট থেকে বঞ্চিত করার–মালিকদের আরো পাওয়ার এবং শ্রমিকদের না-পাওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

ছয়. পূর্বেকার আইনে অগ্নিকাণ্ডের ক্ষেত্রে সতর্কতা, অগ্নিকাণ্ডের ক্ষেত্রে পালানোর পন্থা, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি এবং পানি সরবরাহ অর্থাৎ আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে ব্যবস্থার উল্লেখ ছিল, বর্তমান আইনে তা অনেক শিথিল ও কম বা ফাঁক রাখা হয়েছে। [১৯৬৫ সনের কারখানা আইনের ধারা ২২(১) এবং ১৯৬৯ সনের কারখানা বিধিমালা ধারা ৫১, ৫২ দ্রষ্টব্য] সংশ্লিষ্ট কারখানার শ্রমিক, এলাকাবাসী ও জাতীয় দৈনিক থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী আমরা জানি, এই আইন প্রণীত হওয়া পর্যন্ত আগুনে পুড়ে এবং আগুন থেকে বাঁচতে গিয়ে প্রায় ১,০০০ শ্রমিক নিহত ও কয়েক হাজার শ্রমিক আহত হয়েছে। এমতাবস্থায় যেখানে পূর্বের থেকে কড়া আইনসহ দায়ী খুনি মালিকের কঠোর শাস্তির বিধান রাখার দরকার ছিল, দরকার ছিল আরো কার্যকর নিরাপত্তাব্যবস্থা, সেখানে তা না করে আরো শিথিল ও কম কার্যকর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অথচ নতুন আইনে মালিকের ক্ষতি বা বিনষ্টির জন্য শ্রমিকের মজুরি কর্তনের বিধান রাখা হয়েছে (ঐ ধারা ১২৭)।

সাত. এই শ্রম আইনের চতুর্থ অধ্যায়ের 'প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা' শিরোনামের ধারা অনুযায়ী, নারী শ্রমিক সন্তান প্রসবের আগে ৮ সপ্তাহ এবং পরে ৮ সপ্তাহ সর্বমোট ১৬ সপ্তাহ সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি বা প্রসূতি কল্যাণ সুবিধা ভোগ করবেন। তবে পূর্বেকার মতো এখন আর কোনো 'মা' তাঁর সুবিধাজনক সময়ে (এত দিন বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য মায়েরা সন্তান জন্মের পর অপেক্ষাকৃত বেশি দিন ছুটি নিতেন।) এই ছুটি ভোগ করতে পারবেন না। আবার এই আইনের ধারা ২৮৬ তে নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন সুবিধা না দেয়ার জন্য শাস্তি রাখা হয়েছে তিন মাসের দণ্ড বা মাত্র পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা। এর ফলে একজন মালিককে মাতৃত্বকালীন সুবিধা দিতে গিয়ে সেখানে চার মাসের ছুটিসহ চার মাসের বেতন (মনে করি ৩,০০০X৪=১২,০০০ টাকা) দেয়ার পরিবর্তে শুধুমাত্র ৫,০০০ টাকা জরিমানা দিলেই চলবে, সেখানে তিনি সাধারণত দ্বিতীয় ব্যবস্থাটিই গ্রহণ করবেন। কারণ জরিমানা দেয়াটাই মালিকের জন্য লাভজনক। ফলে আইনের এই শুভংকরের ফাঁকির কারণে এই মাতৃত্বকালীন সুবিধার আইনটি দৃশ্যত থাকলেও কার্যত মাতৃত্ব কল্যাণ ছুটির সুবিধা থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বা সে সুযোগ তৈরি করে দেয়া হয়েছে।

> আগুনে পুড়িয়ে মারার জন্য (অর্থাৎ মালিকপক্ষের অগ্নিকাণ্ড না ঘটার জন্য বা অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি না থাকার কারণে শ্রমিকদের মৃত্যু) মালিকপক্ষের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো শাস্তির বিধান রাখা হয়নি।

আট. এই আইনের *'অপরাধ, দণ্ড এবং পদ্ধতি'* শিরোনামে একটি অধ্যায়ে ধারা ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬ অনুযায়ী কোনো শ্রমিক বেআইনি ধর্মঘটে গেলে, বেআইনি ধর্মঘট বা লক-আউটে প্ররোচিত করলে, ঢিমে তালের কাজে অংশগ্রহণ বা প্ররোচিত করলে এক বছরের দণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। অথচ ধারা ৩৩ এর অধীনে বেআইনি লে-অফ, ছাঁটাই, ডিসচার্জ, বরখাস্ত, অপসারণ অথবা কোনো কারণে চাকরির অবসান ইত্যাদির জন্য মালিক কর্তৃক শ্রম আদালতের কোনো আদেশ অমান্য করার জন্য শাস্তি রাখা হয়েছে মাত্র তিন মাসের কারাদণ্ড বা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা। আগুনে পুড়িয়ে মারার জন্য (অর্থাৎ মালিকপক্ষের অগ্নিকাণ্ড না ঘটার জন্য বা অগ্নিকাণ্ড থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি না থাকার কারণে শ্রমিকদের

মৃত্যু) মালিকপক্ষের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো শাস্তির বিধান রাখা হয়নি।

মালিকের দায়িত্বহীনতা ও নির্মাণসংক্রান্ত নিয়মনীতি না মেনে বিদ্যমান নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ আইন লঙ্ঘনের কারণে কারখানাসমূহে যেসব দুর্ঘটনা (যেমন ২০০৫ সালে সাভারের স্পেকট্রাম গার্মেন্টস ধসে পড়ে ৭৭ জন, ভিন্ন মতানুযায়ী শতাধিক শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা, ২০০৬ সালে তেজগাঁওয়ের ফিনিক্স টেক্সটাইল ধসে শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা–যা আসলে খুনের সমতুল্য) ঘটেছে, তার জন্য মালিক বা সংশ্লিষ্টদের শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে মাত্র চার বছরের কারাদণ্ড অথবা এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ড (ধারা ৩০৯)। উল্লেখ্য, দেশে বর্তমানে এর থেকেও ছোট অপরাধের জন্য বেশি শাস্তির বিধান রয়েছে। এ ছাড়াও গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোতে নারী শ্রমিকদের সাথে অশালীন আচরণ ও তাদের সম্ভ্রমহানির ঘটনা অহরহ ঘটলেও এই অপরাধের জন্য শাস্তি রাখা হয়েছে মাত্র তিন মাসের কারাদণ্ড বা এক হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড, যা নারীর প্রতি উল্লিখিত আচরণ উসকে দিতে পারে বা বাড়িয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ নতুন আইনে শ্রমিকদের জন্য কঠোর শাস্তি ও মালিকদের জন্য কম শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

কিন্তু কারখানা পরিবর্তন করলে শ্রমিকের সার্ভিস বই মালিক যদি ফেরত না দেয় তবে তা উদ্ধার করার বা পাবার কোনো উপায় বলা হয়নি নতুন আইনে।

নয়. সার্ভিস বুক একজন শ্রমিকের শ্রমজীবনের অভিজ্ঞতার স্মারক। নতুন আইনের ধারা ৬ অনুযায়ী প্রত্যেক শ্রমিকের জন্য সার্ভিস বুক রাখতে বলা হয়েছে, কিন্তু তা থাকবে মালিকের কাছে; যদিও এই আইনে আরো বলা হয়েছে, "যদি কোন শ্রমিক সার্ভিস বইয়ের একটি কপি নিজে সংরক্ষণ করিতে চাহেন তাহা হইলে নিজ খরচে তিনি তাহা করিতে পারিবেন।" কিন্তু কারখানা পরিবর্তন করলে শ্রমিকের সার্ভিস বই মালিক যদি ফেরত না দেয় তবে তা উদ্ধার করার বা পাবার কোনো উপায় বলা হয়নি নতুন আইনে। বর্তমানে অনেক কারখানা রাজধানী শহরের বাইরে দূরবর্তী অঞ্চলের দিকে যাচ্ছে। কোনো শ্রমিক যদি নতুন স্থানে চাকরি করতে যেতে না চায় তাহলে তার চাকরি সেই মুহূর্তে শেষ হয়ে যাবে। ওইসব কারখানার শ্রমিকদের জন্য নতুন শ্রম আইনে আইনগত সুরক্ষার কোনো বিধান নেই। ফলে ওই শ্রমিক ইতিমধ্যে যে কয় বছর চাকরি করেছেন সেজন্য তাঁর প্রাপ্ত সুবিধাদি ভোগ করা থেকে বঞ্চিত করাও সহজ হবে। অথচ নতুন আইনে এই সুবিধাদি প্রাপ্তির কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে খুব স্বাভাবিকভাবে মালিকরা আর্থিকভাবে লাভবান হবেন; শ্রমিকরা হবেন ক্ষতিগ্রস্ত।

দশ. শ্রমিকরা যদি নিম্নতম মজুরি বোর্ডের কোনো সিদ্ধান্ত মানার অযোগ্য মনে করেন তাহলে তাঁরা কোথায় প্রতিকার পাবেন–এই শ্রম আইনে তার কোনো উল্লেখ নেই। বরং নতুন আইনের ধারা ১৪০(৭) এ বলা হয়েছে, নিম্নতম মজুরি চূড়ান্ত হলে, *"তৎসম্পর্কে কোনভাবে কোন আদালতে বা কোন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রশ্ন করা বা আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।"* এর ফলে সুবিধাবাদী ও মালিকের পোষা শ্রমিকনেতাদের কোনোভাবে বোর্ডের সদস্য করে, শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি থেকে বঞ্চিত করার সুযোগ আরো বাড়ল, হওয়ার সম্ভাবনাও তা-ই।

এগারো. এই আইনের ধারা ২৮ অনুযায়ী, শ্রমিকের চাকরি থেকে অবসরগ্রহণের বয়স ৫৭ বছর করা হয়েছে (বর্তমানে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে ওই বয়স ৬০ বছর)। এর ফলে সকল কারখানার ৫৭ বছরের বেশি বয়সের শ্রমিকরা নতুন আইন কার্যকর হওয়ার সাথে সাথেই চাকরি হারাবেন। এই আইন কার্যকর হওয়ার ফলে অবসরে যাওয়া শ্রমিক পরিবার চরম অর্থনৈতিক সংকটসহ সামাজিকভাবে চরম নিরাপত্তাহীনতায় পতিত হবেন। ট্রেড ইউনিয়নগুলো সিনিয়র ও অভিজ্ঞ শ্রমিক নেতৃবৃন্দকে হারাবেন, হবেন ক্ষতিগ্রস্ত। প্রচলিত প্রথা হচ্ছে, যত দিন শারীরিক সামর্থ্য থাকবে, তত দিন শ্রমিকরা কাজ করবে। উল্লেখ্য, শ্রমিকের চাকরিজীবনের অবসান ঘটাতে বয়সের মানদণ্ড আরোপ না করার জন্য ২০০৫ সালে উচ্চ আদালতে একটি রায়ও (৪২ ডিএলআর) হয়েছিল। এই আইনের মাধ্যমে সংকুচিত হবে শ্রমিকদের চাকরির ক্ষেত্র।

বারো. এই আইনের ধারা ২৯৯ এ বলা হয়েছে, *"কোন ব্যক্তি অরেজিস্ট্রিকৃত অথবা রেজিস্ট্রি বাতিল হইয়াছে এমন কোন ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তি সংক্রান্ত কোন কর্মকাণ্ড ব্যতীত, অন্য কোন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করিলে অথবা অন্য কোন ব্যক্তিকে উক্তরূপ কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত বা প্ররোচিত করিলে, অথবা উক্তরূপ কোন ট্রেড ইউনিয়নের তহবিলের জন্য সদস্য চাঁদা ব্যতীত অন্য কোনো চাঁদা আদায় করিলে, তিনি ছয় মাস পর্যন্ত কারাদণ্ডে, অথবা দুই হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন।"* এই ধারা দেশের প্রচলিত সংবিধানের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ধারা ৩৭ (সমাবেশের স্বাধীনতা) ও ৩৮ (সংগঠনের স্বাধীনতা)-এর পরিপন্থী এবং আইএলও কনভেনশন '৮৭ ও '৯৮ পরিপন্থী। এই ধারা কার্যকর হলে শ্রমিকদের সাংবিধানিক অধিকার ও আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী প্রাপ্ত অধিকার খর্ব হবে এবং ট্রেড ইউনিয়ন করা পূর্বের থেকে অনেক কঠিন ও দুরূহ হয়ে পড়বে।

তেরো. এই আইনে শ্রমিকের জন্য আইনের বাধ্যবাধকতা পূর্বের থেকে কঠিন ও কঠোর করা হয়েছে, অথচ মালিকের জন্য করা হয়েছে শিথিল ও নমনীয়। করা হয়েছে স্বজনপ্রীতি। যেমন– ধারা ২১১(৮)। এ ছাড়াও ধারা ৩২ অনুযায়ী, কোনো শ্রমিকের যে কোনো প্রকারে চাকরি অবসান হলে/চাকরিচ্যুত হলে মালিক কর্তৃক শ্রমিককে বরাদ্দকৃত বাসস্থান থেকে পুলিশ দিয়ে জোরপূর্বক উচ্ছেদ করতে পারবে। অথচ শ্রমিককে মালিকপক্ষের অন্যায়-অত্যাচারের থাবা থেকে পুলিশের মাধ্যমে রক্ষা পাওয়ার/প্রতিকার লাভের কোনো বিধান রাখা হয়নি। এই ধারাটির অনুমোদন একভাবে দেশের বর্তমান সংবিধানের লঙ্ঘনও বটে। কারণ সংবিধানের 'মৌলিক অধিকার' অধ্যায়ের ২৭ ধারায় বলা আছে, *"সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।"* সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষাকারী দেশের শোষক ও উৎপীড়ক শ্রেণিসমূহের সরকার ও আইন প্রণেতাদের কাছ থেকে শ্রমিক স্বার্থের অনুকূল আইন প্রত্যাশা করা যায় কি?

চৌদ্দ. এই আইনে শ্রমের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে, অথচ শ্রম অনুযায়ী উপযুক্ত মজুরিসহ শ্রমিকের অধিকার ভোগ করার বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়নি (যেমন– ৯ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

কী আছে মহাজোট সরকারের শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এ?

বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩ এর শ্রমিক ও শিল্পস্বার্থ

বিরোধী কয়েকটি অগণতান্ত্রিক ধারা হচ্ছে :

১) শ্রম (সংশোধন) আইনের ২০৫ ধারায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণমূলক কমিটির (Workers Participatory Committee) বিধান রেখে বলা হয়েছে, *'যে প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন নাই, সেই প্রতিষ্ঠানে ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত না হওয়া পর্যন্ত অংশগ্রহণ কমিটির শ্রমিক প্রতিনিধিগণ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।'* এটা হলে আর ইউনিয়ন করার সুযোগ থাকবে না। মালিকরা বলবে– শ্রমিকদের অংশগ্রহণমূলক কমিটি আছে, এটাই সিবিএর মতো কাজ করছে। মালিক ও মালিকের আস্থাভাজন শ্রমিকের সমন্বয়ে গঠিত এই কমিটি কার্যত ট্রেড ইউনিয়নের বিকল্প রূপেই থাকবে। এটা কখনোই ট্রেড ইউনিয়নের বিকল্প হতে পারে না। কারণ ট্রেড ইউনিয়ন হচ্ছে শ্রমিকদের দ্বারা এবং শ্রমিকদের জন্য গঠিত সংগঠন। যেহেতু এই আইনে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন গঠনের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, সেহেতু এই কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে কার্যত কারখানায় শ্রমিক ইউনিয়ন গঠনের বিষয়টি দীর্ঘসূত্রীতার দিকে ঠেলে দেয়া হলো।

২(ক) ১৭৯ ধারায় বলা হয়েছে, একটি প্রতিষ্ঠানে তিনটির বেশি ইউনিয়ন থাকতে পারবে না। এবং ৩৫ জনের বেশি ইউনিয়ন কর্মকর্তা থাকতে পারবেন না। বাংলাদেশ সরকার অনুসমর্থিত আইএলও কনভেনশন '৮৭ অনুযায়ী, একটি প্রতিষ্ঠানে কয়টি ইউনিয়ন থাকবে বা কতজন কর্মকর্তা হবেন, তা শ্রমিকরাই নির্ধারণ করবে। কিন্তু এক্ষেত্রে শ্রমিকদের সে অধিকার খর্ব করা হয়েছে।

(খ) ১৮০ (১) ধারায় বলা হয়েছে, কারখানায় কর্মরত শ্রমিক ছাড়া কেউ ট্রেড ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হতে পারবে না। অর্থাৎ ট্রেড ইউনিয়ন করতে পারবে না। অথচ মালিকদের সমিতির ক্ষেত্রে এরূপ কোনো বিধি-নিষেধ নেই। বৈষম্যমূলকভাবে শুধুমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যনির্বাহী কমিটিতে এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা শতকরা মাত্র ১০ এ সীমিত রাখা হয়েছে। এই ধারার কারণে যে কোনো সময় মালিক কোনো শ্রমিককে ছাঁটাই করলে তিনি আর ইউনিয়ন করতে পারবেন না। কারণ ছাঁটাই করা শ্রমিক তখন কারখানার বাইরের লোক বলে বিবেচিত হবে। ফলে তিনি আর ইউনিয়নের সদস্য থাকতে পারবেন না, ইউনিয়ন করতে পারবেন না। শ্রমিকরা আইন জানা, শিক্ষিত, দক্ষ নেতৃত্ব কর্তৃক পরিচালিত হওয়া থেকে বঞ্চিত হবেন। মালিকদের ক্ষেত্রে এরূপ কোনো বিধি-নিষেধ রাখা হয়নি যা বৈষম্যমূলক। এই ধারাটির মাধ্যমে শ্রমিকদের নিজেদের পছন্দমতো নেতা নির্বাচন ও সংগঠন করার অধিকার খর্ব করা হয়েছে, যা বাংলাদেশ সরকার অনুসমর্থিত আইএলও কনভেনশন '৮৭ ও '৯৮ পরিপন্থী। পূর্বেকার ১৯৬৯ সালের আইনে কারখানার শ্রমিক না হয়েও ২৫% অশ্রমিক সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন উভয় খাতের যে কোনো কারখানায় ইউনিয়ন করতে পারত। অথচ স্বাধীন বাংলাদেশে শ্রমিকদের পূর্বে অর্জিত সে অধিকারও হরণ করা হলো।

(গ) পূর্বেকার আইনে একই ধরনের বা একই প্রকারের শিল্পে নিয়োজিত বা শিল্প পরিচালনারত প্রতিষ্ঠানগুলোতে গঠিত দুই বা ততোধিক ট্রেড ইউনিয়ন নিয়মানুযায়ী সিদ্ধান্ত নিলে ফেডারেশন গঠন ও রেজিস্ট্রেশন করার জন্য দরখাস্ত করতে পারত। সংশোধিত আইনে ২০০(১) ধারায় থাকা *'দুই বা ততোধিক ট্রেড ইউনিয়ন'*- এর পরিবর্তে *'পাঁচ বা ততোধিক ট্রেড ইউনিয়ন এবং একাধিক প্রশাসনিক বিভাগে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন'* শব্দগুলো প্রতিস্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ এর মাধ্যমে ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন করার কাজটি আরো কঠিন করে দেয়া হলো।

৩) ১(৪) ধারায় বলা হয়েছে কারা সংগঠন করতে পারবে না, আর কারা শ্রম আইনের আওতায় পড়বে না। এই ধারার মাধ্যমে অসংগঠিত বা অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকদেরকে শ্রম আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। এ ধারা বৈষম্যমূলক এবং অগণতান্ত্রিক। কারণ শ্রমিকের অধিকার এবং শ্রম আইনের আওতা থেকে কোনো শ্রমিককে বাদ দেয়া যায় না। অথচ বাংলাদেশের শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় ৯০% হচ্ছে অসংগঠিত শ্রমিক।

৪) ২(১০) ধারায় বেসরকারি শ্রমিক ১০ বছর পর্যন্ত চাকরি করলে একটা এবং ১০ বছরের অধিক চাকরির জন্য দেড়টা গ্র্যাচুইটি পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। অথচ বর্তমানে সরকারি/রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের প্রতিষ্ঠানে বছরে দুইটা গ্র্যাচুইটির বিধান আছে। এবং তা ব্যক্তিমালিকানাধীন অনেক কল-কারখানার শ্রমিকরাও ভোগ করছেন। শ্রমিকের চাকরির স্থায়িত্ব রক্ষায় কার্যকর কোনো ব্যবস্থা না রেখে অর্থাৎ ছাঁটাই, ডিসচার্জ, টারমিনেশন, ইস্তফা সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহে প্রয়োজনীয় সংশোধনী না আনায় এর মধ্য দিয়ে শ্রমিকের প্রাপ্য কমিয়ে দেয়া হলো। তাছাড়া সমকাজে সমমজুরির পরিবর্তে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের শ্রমিকদের মধ্যে বৈষম্যও সৃষ্টি করা হলো।

৫) ৪(১১) ধারায় আউটসোর্সিং এর বিধান রাখা হয়েছে। এটা থাকলে ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োগকৃত শ্রমিক দিয়েই কাজ চালাতে চাইবে মালিক। ফলে নিয়মিত চাকরি বলে আর কিছু থাকবে না। শ্রমিকদেরকে আইন অনুযায়ী অনেক প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা সহজ হবে।

৬) ২৩(৩) ধারায় বলা হয়েছে, *"মালিকের অধীন তাঁহার বা অন্য কোন শ্রমিকের চাকরি সংক্রান্ত ব্যাপারে ঘুষ গ্রহণ বা প্রদান; প্রতিষ্ঠানে উচ্ছৃঙ্খল বা দাঙ্গা-হাঙ্গামামূলক আচরণ, অথবা শৃঙ্খলা হানিকর কোন কর্ম; করার এই অসদাচরণের জন্য কোন শ্রমিককে বরখাস্ত করা হইলে তিনি কোন ক্ষতিপূরণ পাইবেন না। তবে এইরূপ ক্ষেত্রে অন্যান্য আইনানুগ পাওনাদি যথানিয়মে পাইবেন।"* ফলে ১০-১৫ বছর চাকরি করে একজন শ্রমিককে প্রায় শূন্যহাতে চলে যেতে হবে। এটা মালিকের হাতে একটা ভয়ংকর অস্ত্র। অসদাচরণের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, তাতে মালিক কারখানা বা কারখানার বাইরের যে কোনো ঘটনায়, দুর্ঘটনায় শ্রমিকের ওপর দোষ চাপাতে পারবেন। এই ধারার অপপ্রয়োগের আশঙ্কা অনেক বেশি। অতীতে এ ধরনের আইনের শিকার হয়েছে শ্রমিক। বাস্তবে এটা একটা চূড়ান্ত রকমের স্বৈরতান্ত্রিক আইনে পরিণত হবে।

৭) ২৭ এর ৩(ক) ধারায় মালিকের হাতে এমন অধিকার দেয়া হয়েছে, যা প্রয়োগ করে কোনো শ্রমিক বিনা অনুমতিতে ১০ দিনের অধিক কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকলে শ্রমিকের সমস্ত পাওনা থেকে মালিক তাঁকে বঞ্চিত করতে পারবেন।

৮) ৪৬ ধারায় নারী শ্রমিকদের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাসই রাখা হয়েছে। প্রসূতিদের জন্য সর্বত্র ৬ মাস মাতৃত্বকালীন ছুটি প্রযোজ্য। এ আইন বৈষম্যমূলক। কারণ রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নারী শ্রমিকসহ অনেক ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের জন্য মাতৃত্বকালীন ছুটি ৬ মাস রয়েছে। সাভারের রানা প্লাজায় দুইজন নারী শ্রমিকের সন্তান প্রসব এবং সন্তানসহ নির্মম মৃত্যুর ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে

দেখিয়ে দিয়েছে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিগুলোতে মাতৃত্বকালীন ছুটি দেয়ার চিত্র।

৯) আগের আইনে চাকরি অবসানের ৭ দিনের মধ্যে প্রদেয় মজুরি পরিশোধের বিধান ছিল। বর্তমানে এ আইনের ১২৩(২) ধারায় এখন তা ৩০ দিন ধার্য করা হয়েছে। এতে শ্রমিকদের হয়রানি ও ভোগান্তি আরো বাড়বে।

১০) ১৫৫ ধারায় ক্ষতিপূরণ বণ্টনের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, *"জখমের ফলে মৃত শ্রমিক সম্পর্কে প্রদেয় ক্ষতিপূরণ শ্রম আদালত ভিন্ন অন্য কোন পন্থায় পরিশোধ করা যাইবে না।"* এ ধারাটি থাকলে ক্ষতিপূরণ পাওয়ার ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রতা ও জটিলতা সৃষ্টি হবে।

১১) ২১১ ধারায় ধর্মঘট করার গণতান্ত্রিক অধিকারকে আগের থেকে কঠিনতর করা হয়েছে, যা এই অধিকার খর্ব করার নামান্তর। কারণ পূর্বেকার আইনে তিন-চতুর্থাংশ শ্রমিক ধর্মঘট করার জন্য মত দিলে ধর্মঘট করা যেত। সংশোধনীতে 'তিন-চতুর্থাংশ' এর পরিবর্তে 'দুই-তৃতীয়াংশ' করা হয়েছে।

১২) ধারা ২৩৪ এর (ক) উপধারা (১) এর দফা (খ) এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত নতুন দফা (খ) এ বলা হয়েছে, *"এর মালিক প্রত্যেক বৎসর শেষ হইবার অন্যূন নয় মাসের মধ্যে, পূর্ববর্তী বৎসরের নিট মুনাফার ৫ শতাংশ (৫%) অর্থ ৮০ঃ১০ঃ১০ অনুপাতে যথাক্রমে অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদান করিবে।"* পূর্বেকার আইনে মুনাফার ৫% সকল শ্রমিকের প্রাপ্য ছিল। কিন্তু মালিকরা তা কখনো দিতে চাইতেন না। এবারকার সংশোধনীর ফলে মুনাফার অংশ পাওয়া শ্রমিকদের জন্য আরো কঠিন হয়ে দাঁড়াল। শ্রমিকরা, বিশেষ করে গার্মেন্টস শ্রমিকরা মুনাফার অংশ পাবেন না এবং ভবিষ্যতে রফতানিমুখী শিল্পের তালিকা যত বাড়বে, শ্রমিকের প্রাপ্য অধিকার তত কমবে। শ্রমিকের ন্যায়সংগত প্রাপ্য মুনাফার অংশ তাঁকে সরাসরি দেয়াই সংগত। শ্রমিকের টাকায় অংশগ্রহণ তহবিল ও কল্যাণ তহবিল করা 'মাছের তেলে মাছ ভাজা'র নামান্তর।

নতুন এই সংশোধনীতে প্রচলিত আইনের অন্যান্য অগণতান্ত্রিক অনেক ধারার মধ্যে ২৬ ধারাটি বহাল রাখা হয়েছে। ২৬ ধারা অনুযায়ী যে কোন শ্রমিককে ১২০ দিনের বেতন দিয়ে অথবা ৪ মাস আগে নোটিশ দিয়ে ছাঁটাই করার ক্ষমতা মালিকের হাতে দেয়া আছে। এ ধারার বিরুদ্ধে পাকিস্তান আমলেও শ্রমিকরা আন্দোলন করেছিল। তখন এটা ছিল ১৯(ক) ধারা। এই ধারা বলবৎ থাকলে শ্রমিকের চাকরির নিরাপত্তা বলে কিছু থাকবে না। এই ধারার অপব্যবহার করে মালিকরা শ্রমিকদের সংগঠন করার তথা ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার বাধাগ্রস্ত করবে। এ ছাড়াও জারি রাখা হয়েছে ধারা ১৭৯(২), যেখানে বলা হয়েছে, কোনো কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার জন্য ওই কারখানার মোট কর্মরত শ্রমিকের মধ্যে কমপক্ষে ৩০%কে সদস্য হতে হবে। এই আইনটির কারণে সরকার ও মালিকের দালালমুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার কাজটি আরো কঠিন হয়েছে। কারণ আমাদের দেশের অনেক কারখানাতেই এখন শ্রমিকের সংখ্যা এত বেশি যে (যেমন অনেক গার্মেন্ট কারখানায় শ্রমিকের সংখ্যা ২০ থেকে ৩০ হাজার) তাদের মধ্য থেকে শতকরা ৩০ জনকে সদস্য করে ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করা প্রায় দুঃসাধ্য একটি কাজ।

এই আইনের ধারাগুলো এই নিষ্ঠুর সত্য পুনরায় তুলে ধরেছে যে, সব সময়ে আমাদের দেশের আইনের ধারাগুলো এমনভাবে লেখা হয়, যা মালিকশ্রেণিকেই রক্ষা করে, যে আইনের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে রক্ষা পেতে পারে শোষক মালিকশ্রেণি তথা শাসকগোষ্ঠী; কিন্তু শ্রমিকরা তা পারে না!

মহাজোট সরকারের এই শ্রম (সংশোধন) আইনের শ্রমিকদের অন্যতম প্রধান দাবি ট্রেড ইউনিয়ন করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাধা-বিপত্তি রহিত করা হয়নি। বরং কিছু ক্ষেত্রে পূর্বের তুলনায় আরো কঠিন করা হয়েছে। পূর্বে প্রাপ্ত অনেক সুবিধা থেকে শ্রমিকদের বঞ্চিত করা হয়েছে। অথচ 'The Principle of Natural Justice' অনুযায়ী ইতিমধ্যে অর্জিত কোনো অধিকার কর্তন করা যায় না। শ্রম আইন সংশোধনের নামে যা করা হয়েছে, তা কার্যত শ্রম অধিকার সংকোচন আইন। এ আইন প্রবর্তিত হলে শ্রমিক সংগঠন ও আন্দোলন করার গণতান্ত্রিক অধিকারসহ মৌলিক অধিকার সংকুচিত হবে। এই শ্রম আইন কার্যত মালিকশ্রেণির স্বার্থেই প্রণয়ন করা হয়েছে। এই সংশোধনীর মাধ্যমে দেশের সংবিধান এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুসমর্থিত আইএলও কনভেনশন '৮৭ (সংঘবদ্ধ হওয়ার স্বাধীনতা ও সংগঠনের অধিকার সংরক্ষণ কনভেনশন) ও '৯৮ (সংগঠন করার ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার কনভেনশন) কে খর্ব ও তাচ্ছিল্য করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ ও বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩-এর কি কোনো ইতিবাচক দিক নেই? উত্তরে বলতে হয়, আছে। তবে তা প্রয়োজন অনুযায়ী মালিকদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থার তুলনায় তেমন কিছুই নয়। অনেকটা জনমানবহীন মরুভূমিতে কয়েক দিনের পিপাসার্ত পথিকের এক আঁজলা জলপানের সুযোগ পাওয়ার মতো।

পরিশেষ

শ্রম আইন, ২০০৬ জারি থাকলে এবং শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩ কার্যকর হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে শিল্প খাত। প্রচলিত শ্রম আইন এবং এই নতুন সংশোধনীর মাধ্যমে চরমভাবে শ্রমিকস্বার্থ তথা শিল্পস্বার্থ বিরোধী অবস্থান নেয়া হয়েছে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় পক্ষপাতমুক্ত অবস্থান না নিয়ে একপক্ষীয়ভাবে মালিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা হয়েছে। দেশের প্রচলিত সংবিধানে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতিকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। এই শ্রম আইন আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুসমর্থিত শ্রম অধিকারের বিধান আইএলও কনভেনশন '৮৭ ও '৯৮ পরিপন্থী। দরকার অগণতান্ত্রিক শ্রম আইন ও শ্রম (সংশোধন) আইন সংশোধন অথবা বাতিল করে অবাধ ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারসহ শিল্প ও শ্রমিকস্বার্থ রক্ষাকারী গণতান্ত্রিক শ্রম আইন।

সামগ্রিকভাবে পর্যালোচনা করে নির্দ্বিধায় বলা যায়, আমাদের দেশের প্রচলিত শ্রম আইন শ্রমিকদের নয়, বস্তুত মালিকশ্রেণির রক্ষাকবচ; মালিকের দ্বারা, মালিকের জন্য প্রণীত। এই আইন আমাদের দেশের টেকসই শিল্পায়নের সহায়ক নয়, বরং বৃহৎ পুঁজি ও সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থ রক্ষাকারী বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এডিবির 'শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী, প্রকৃত ও কার্যকর শিল্পায়নের ভিত্তি ধ্বংসকারী' প্রেসক্রিপশনের প্রতিফলন মাত্র।

শামীম ইমাম: আহ্বায়ক, জাতীয় গণতান্ত্রিক শ্রমিক ফেডারেশন
ইমেইল: shamim.uclb@gmail.com